তারিখ ...19 SEP 2015...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৩...

সমকাল

বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং ও বাংলাদেশ

উচ্চশিক্ষা | আমিনুল ইসলাম

শিক্ষক ও গবেষক

বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার ভর্তি হতে পারলে সেকেন্ড ক্লাস নিয়ে পাস করে বেরিয়ে যাওয়া যাবে, এ ধরনের একটা বিষয় মনে হয় দীর্ঘদিন ধরে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রচলিত আছে। পড়াশোনা কতদূর কী করতে হবে, আদৌ করতে হবে কি-না, এ নিয়ে অবশ্য কোনো ধারণা প্রচলিত আছে কি-না আমার জানা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারলেই চলছে!

পুরো পৃথিবীতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যে র‍্যাঙ্কিং হয় এর মাঝে 'টাইমস হায়ার এডুকেশন' আর 'কিউ এস' র‍্যাঙ্কিং সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য তাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছে। এটি মূলত নির্ভর করে কোন পদ্ধতির মাধ্যমে র‍্যাঙ্কিং করা হয়েছে তার ওপর। এ দুটি র‍্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর রেটিং করা হয়। এ ক্ষেত্রে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত, বিদেশি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, বিদেশি শিক্ষকের সংখ্যা, গবেষণা প্রকাশনা, কোন জার্নালে সেটি প্রকাশ করা হলো, কতবার সেটি সাইট করা হলো, গবেষণা প্রকল্প, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, সাবেক ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের অবস্থান– সবকিছু বিবেচনায় নেওয়া হয়ে থাকে। আর এজন্য বিশেষ করে 'টাইমস হায়ার এডুকেশন' র‍্যাঙ্কিংটি পৃথিবীর বড় ও নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে শুরু করে প্রায় সব জায়গাতেই গ্রহণযোগ্য।

ইংল্যান্ড, আমেরিকা কিংবা ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ঢুকলে দেখা যাবে, 'টাইমস হায়ার এডুকেশন' অনুযায়ী তাদের বিশ্ববিদ্যালয় কত নম্বরে আছে সে তথ্য তারা দিয়ে রেখেছে। এ থেকেই বোঝা যায় এর গুরুত্ব কতখানি হতে পারে।

বাংলাদেশে অবশ্য মাঝে মধ্যেই অনেককে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনের লোকদের বলতে শোনা যায়, এসব র‍্যাঙ্কিংয়ের কোনো মূল্য নেই! ঠিক কোন কারণে তারা এটি বলে থাকে সেটি বোঝার জন্য অবশ্য খুব দূরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এবার ২০১৫ সালের জন্য 'টাইমস হায়ার এডুকেশন' এশিয়ার সেরা ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশ করেছে। সেখানে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই! প্রায় ১৬ কোটি জনসংখ্যার দেশ বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম না থাকলেও ছয় লাখ জনসংখ্যার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রাষ্ট্র ম্যাকাও থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ঠিকই স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই আসলে কোনো প্রতিষ্ঠিত র‍্যাঙ্কিংয়ে জায়গা করে নিতে পারছে না দীর্ঘদিন ধরে। আর এ কারণেই হয়তো নিজেদের অপারগতা ঢাকতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এটিকে তেমন গুরুত্ব দিতে চাইছেন না।

জানা গেছে, টাইমস হায়ার এডুকেশন থেকে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছ থেকে তথ্য ও ডাটা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই আপডেটেড কোনো তথ্য দিয়ে তাদের সহায়তা করেনি। এ থেকেই বোঝা যায়, কতটা উদাসীন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসন। অবশ্য এসব বিষয়ে কোনো গবেষণা বাংলাদেশে হয় কিনা কিংবা তাদের কাছে আদৌ কোনো ডাটা আছে কিনা সেটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছে এক ছাত্র আমাকে আক্ষেপ করে বলেছে, সে নাকি বিশ্ববিদ্যালয়টির আবাসিক হলে থাকতে পারে না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ছাত্রদের হলে থাকার কোনো ব্যবস্থা নাকি নেই। অনার্স, মাস্টার্সের ছাত্ররা হলে থাকতে পারলেও পিএইচডি লেভেলের ছাত্রদের হলে থাকার নিয়ম নেই। মেয়েরা নাকি আবার থাকতে পারে। এই অদ্ভুত নিয়ম ঠিক কেন চালু রয়েছে আমার জানা নেই। এই তথ্যটি যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে এর মানে কী দাঁড়াচ্ছে?

পিএইচডি লেভেলে ছাত্ররা মূলত গবেষণা করে থাকে। তাদের আসলে গবেষণা ছাড়াই বলা হয়ে থাকে। এরা অনেক সময় বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গেও যুক্ত থাকে। দীর্ঘ তিন থেকে চার বছর, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর চেয়েও লম্বা সময় ধরে গবেষণা করার পরই তারা পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করে। তাহলে এই লম্বা সময়ে থাকার জন্য কেন তাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনো ব্যবস্থা করা হচ্ছে না? এমন তো না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো আবাসিক হল নেই। হল থাকার পরও পিএইচডি লেভেলে ছাত্রদের থাকার জন্য কেন কোনো বৈধ ব্যবস্থা থাকবে না? আর যদি আবাসিক হলের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে এর মানে দাঁড়াচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়টি গবেষণার ওপর একদমই গুরুত্ব দিচ্ছে না। একটি ছাত্র যদি জানে, সে পিএইচডি ছাত্র হিসেবে পড়াশোনা করলে তার আবাসিক কোনো সুবিধা থাকবে না, তাহলে সে কি পিএইচডি করতে, গবেষণা করতে উৎসাহিত হবে!

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন আর মৌলিক কোনো গবেষণা হয় না বললেই চলে। শিক্ষার মান নিয়েও রয়েছে নানা সমস্যা। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কি এখন আন্তর্জাতিক কোনো ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে? করলে এর সংখ্যা ঠিক কত? সংখ্যা কি কমছে না বাড়ছে। আর যারাও-বা পড়ছে পড়াশোনার মান নিয়ে তাদের মতামতই-বা কী! এ নিয়ে তো কখনও কিছু লিখতে বা বলতে শোনা যায় না। অথচ একটা সময় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করতে আসত।

বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয়ে থাকে এমন এক জায়গা, যেখানে ছাত্র ও শিক্ষকরা হবে সময়ের চেয়ে এগিয়ে। আর এটি হতে হয় সাধারণত শিক্ষকদের হাত ধরে। শিক্ষকরা নতুন নতুন বিষয় শুধু আবিষ্কারই করে না; পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় যেসব বিষয় আবিষ্কৃত হচ্ছে সেগুলোও নিজেরা জেনে নেয় নানা জার্নাল থেকে পড়ে আর এভাবেই তারা নিজেদের যুগোপযোগী এবং যুগের চেয়ে এগিয়ে রাখে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কি নিজেরা যুগোপযোগী? তারা কি সবাই পৃথিবীর নানা জায়গায় যেসব নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে, সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারছে কিংবা জানার জন্য যে টুলসগুলো দরকার, যেমন ইন্টারনেটের মাধ্যমে জার্নালগুলোর এক্সেস কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কমিউনিকেশন কি তারা সবসময় করে থাকে? পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকদের সঙ্গে তাদের মিথস্ক্রিয়া কি আদৌ আছে!

নেই বলেই মনে হয়। যদি থাকত তাহলে অন্তত পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাঝে না হোক, এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাঝে তো অন্তত এক-দুটি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ থেকে থাকা উচিত ছিল। বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই তালিকায় স্থান হয়নি।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীদের মাঝে এ কথা বহুল প্রচলিত আছে, ভর্তি হতে পারলে কোনোভাবে সেকেন্ড ক্লাস নিয়ে বের হয়ে যাওয়া যাবে। এ ধরনের একটা মানসিকতা আসলে ঠিক কোথা থেকে তৈরি হয়েছে! ভর্তি হলেই কীভাবে পাস করে বেরিয়ে যাওয়া যাচ্ছে! এখন বলা হতে পারে, এটি আসলে কথার কথা। তবে প্রচলিত আছে, 'যা রটে, তার কিছু বটে!' একজন ছাত্র যদি ভর্তি হওয়ার সময় এই মানসিকতা নিয়ে ভর্তি হয়, ভর্তি তো হয়েছি, এবার কোনো না কোনোভাবে পাস করে বেরিয়ে যেতে পারব। তাহলে এর দায় আসলে কার ওপর গিয়ে বর্তায়! নিশ্চয়ই পুরো প্রক্রিয়ার ওপর গিয়েই বর্তাবে।

এর চেয়েও আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে, নিজেদের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে, সেগুলোকে কীভাবে দূর করা যায়, কীভাবে নিজেদের স্থান ওই তালিকায় করে নেওয়া যায়, এই নিয়ে কোনো রকম কার্যক্রম হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দেখা যাবে না। উল্টো দেখা যাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রশাসন এর সব র‍্যাঙ্কিংয়ের কোনো মূল্য নেই বলে ঘোষণা করবে!

এ বিষয়ে একটা বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যায়। শুধু যে পৃথিবীর নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই এই র‍্যাঙ্কিংয়ের গুরুত্ব দেওয়া হয় তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে পৃথিবীর নানা ইমিগ্রেশন ও ভিসা অফিসেও এর গুরুত্ব রয়েছে। আমি যখন সুইডেনের লুন্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করে ডেনমার্কের গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করেছিলাম, তখন দেখা গেল ওদের ওখানে পয়েন্ট সিস্টেম প্রচলিত আছে। ১০০ পয়েন্ট পেলে গ্রিনকার্ড পাওয়া যাবে। এর মাঝে শিক্ষা, গবেষণা, অভিজ্ঞতা, ভাষার জন্য আলাদা আলাদা পয়েন্ট আছে। এ ছাড়াও কেউ যদি 'কিউএস কিংবা 'টাইমস হায়ার এডুকেশন' র‍্যাঙ্কিংয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে থাকে, তার জন্য রয়েছে বোনাস পয়েন্ট। এই যেমন র‍্যাঙ্কিংয়ে পৃথিবীর প্রথম ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে কেউ যদি পড়াশোনা করে থাকে, তাহলে ২০ পয়েন্ট এমনি এমনি পেয়ে যাবে। প্রথম ২০০টির মাঝে থাকলে ১৫ পয়েন্ট আর প্রথম ৪০০টির মাঝে থাকলে ১২ পয়েন্ট। আমি নিজে যেহেতু সেই সময়ের র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি, তাই ২০ পয়েন্ট এক্সট্রা পেয়ে গিয়েছিলাম। অর্থাৎ সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার একটা ক্যাপিটাল রিওয়ার্ড আমি পেয়ে গিয়েছিলাম। আর এখানেই পড়াশোনার মান আর তার স্বীকৃতি ব্যাপারটি বোঝা যায়।

এই বাস্তব উদাহরণ দেওয়ার কারণ হচ্ছে, র‍্যাঙ্কিং সিস্টেমের আসলে যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। র‍্যাঙ্কিংয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র ও শিক্ষকদের মাঝে এক ধরনের স্পৃহা কাজ করে নিজেদের আরও মেলে ধরার জন্য, আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য। নিজেদের মান সম্পর্কেও একটা ধারণা পাওয়া যায়। তাই বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এদিকে নজর দেওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রতিবছর নিয়ম করে পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ হয়। সেখানে প্রায় ১৬ কোটি জনসংখ্যার একটি দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাঁই না হওয়াটা যথেষ্ট পীড়াদায়ক বলেই মনে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনের ঘুম ভাঙার দরকার আছে বৈকি।

tutul_ruk@yahoo.com